উচ্চ ও মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

নব-পরিকল্পনা অনুযায়ী লিখিত অতিরিক্ত অবশ্য-পাঠ্য পুস্তক।

# স্বামীজীর কথা ও গল্প

'যাঁদের করি নমস্কার', 'ছোটদের রামায়ণ' প্রভৃতি

শিশু-গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীপ্রদীপ কুমার মিত্র

রচিত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

# সূচীপত্র

# স্বামী বিবেকানন্দ

কলিকাতা সহরের সিমলা অঞ্চলে গৌর-মোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট নামে একটি ছোট্ট গলি আছে—সেই গলিরই একটি বাড়ীতে আজ হইতে প্রায় নব্বই বছর আগে, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। বাপ-মা নাম রাখেন নরেন্দ্রনাথ। পরে ইনিই স্বামী বিবেকানন্দ নামে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হন। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং গান্ধীজী—ইঁহারাই বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীতে অন্যদেশের কাছে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথ খুব সুপুরুষ ছিলেন। বিশাল আয়ত চোখ, ফরসা রং, দীর্ঘ চেহারা। আবার

তেমনই মিষ্টগানের গলা। আর তেমনি মেধা—যা একবার শোনেন তাই মুখস্থ হইয়া যায়।

নরেন্দ্রনাথের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন সেকালের নামকরা উকীল। অতিথি অভ্যাগত সন্ন্যাসীর ভীড় লাগিয়াই থাকিত বাড়ীতে। ছেলেবেলা হইতেই এইসব সন্ন্যাসী সম্বন্ধে নরেনের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। অবসর পাইলেই তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিতেন। আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গিয়াছিল বাল্যকালেই। নরেন ছিলেন খুব জেদী ছেলে আর অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত। একবার জেদ ধরিলে আর রক্ষা নাই। কেহ তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিত না। কিন্তু মা 'শিব' 'শিব' বলিয়া একটু জল মাথায় দিলেই ছেলেও 'জল' হইয়া যাইত। শান্তশিষ্ট—আর যেন সে আগেকার দুর্দ্দান্ত ছেলেই নয়।

নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতেন। মধ্যে বৎসর দুই লেখাপড়া প্রায় বন্ধ থাকিলেও বেশ অল্প বয়সেই তিনি এন্‌ট্রান্স পাস করেন। শুধু তাই নয়—ইংরেজী ভাষা ইস্কুলে থাকিতেই এমনভাবে আয়ত্ত করেন যে, যে কোন

সময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যে কোন বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। পড়াশুনায় যেমন, শরীর চর্চ্চাতেও তেমনি মনোযোগ ছিল। সিমলাপাড়ার বিখ্যাত ব্যায়ামবীরদের সঙ্গে পাড়ারই একটি আখড়ায় নিয়মিত কুস্তি শিখিতেন।

এন্‌ট্রান্সের পর প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলেও ম্যালেরিয়ার জন্য বৎসর খানেক আবার নষ্ট হইল। তাহার পর, ভর্ত্তি হইলেন জেনারেল য়্যাসেম্ব্লিজ কলেজে ( বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ )। এই সময় হইতেই তাঁহার মন সমাজ ও ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট লইল। হিন্দুধর্ম্ম বহুকালের জিনিষ। সব পুরাতন জিনিষের মতই হিন্দুধর্ম্মেও নানা আবর্জ্জনা আসিয়া জমিয়াছিল। ধর্ম্মের আবর্জ্জনা কতকগুলি বৃথা অসার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার। আসল হিন্দুধর্ম্মও এই সবে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। মনীষী রামমোহন রায় অনেক দিন হইতেই ইহা বুঝিয়া হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারে মন দিয়াছিলেন, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুরা সে সংস্কারকে মানিয়া লয় নাই—উহাকে

আলাদা একটা ধর্ম্ম হিসাবে দেখিতেছিল, নাম দিয়াছিল ব্রাহ্মধর্ম্ম। যাঁহারা এই নূতন ধর্ম্মমত মানিতেন, তাঁহাদের বলা হইত ব্রাহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানী। রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মনীষী ও নেতাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম্ম খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নরেন্দ্রনাথও কলেজ জীবনে প্রবেশ করিয়া এই দিকেই আকৃষ্ট হইলেন। তিনি নিজেও চিরকাল ছুঁৎমার্গ ও জাতিভেদের বিরোধী। মেথরকে স্পর্শ করা, কি মুসলমানের হুঁকায় তামাক খাওয়া তখন নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই ইহা মানিতেন না। এখন ব্রাহ্মদের চেষ্টায় বেদ উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্মের আসল শাস্ত্রগ্রন্থগুলির প্রচার হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন তাঁহার বিশ্বাসই ঠিক, ধর্ম্ম বা শাস্ত্রের মধ্যে এসব কথা নাই। এগুলি নিতান্তই অসার।

ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে এক আশ্চর্য্য মানুষের আবির্ভাব হইল। এক নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ,

বিশ্বাস, কঠোর তপস্যা ও যোগসাধনার বলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—এই কথাই মুখে মুখে শোনা যায়। সহজ কথা, সস্নেহ ব্যবহার, অতি সাধারণ উপমা ও গল্পের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের মূল কথাটির ব্যাখ্যা—এইতেই তিনি সকলের চিত্তজয় করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত পাণ্ডিত্যাভিমানী মানুষ তাঁহাকে পরাজয় করিতে গিয়া পরাজিত হইয়া আসেন। সব ধর্ম্মেরই সার কথা ইনি জানেন—তাই জানেন, সব মতই এক; যেমন সব নদীই সমুদ্রে পড়ে তেমনি সব সাধনাই একদিকে চলে। ছাদে ওঠাই লক্ষ্য, সিঁড়িটা উপলক্ষ্য মাত্র—সুতরাং সে সিঁড়ি ইঁটের হইল কি পাথরের হইল দেখিবার দরকার নাই। ধর্ম্মমত ও সাধনার পার্থক্য এই সিঁড়ির উপাদানেরই মত তুচ্ছ, আসল লক্ষ্য ত ছাদে ওঠা বা ভগবানের কাছে পোঁছানো! এই কথাই বলেন সেই সরল মূর্খ ব্রাহ্মণ—রামকৃষ্ণ পরমহংস, পরবর্ত্তীকালে বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য মনীষীরাও যাঁহার কাছে মাথা নোয়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের কানেও ঠাকুরের কথা পৌঁছায়,

কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেন না। অবশেষে একদিন যোগাযোগ হইল। পাড়ায় কোন ভক্তের বাড়ী ঠাকুর আসিয়াছিলেন। এই ভক্ত জানেন নরেন্দ্র নাথ খুব ভাল গান গাহিতে পারেন, অতি মিষ্ট ও মার্জ্জিত কণ্ঠস্বর তাঁহার—তিনি জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলেন নরেন্দ্রনাথকে। নরেনের মুখে দেহতত্ত্ব ও ভজন গান শুনিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তখনই নরেনের সব পরিচয় লইয়া অনুরোধ করিলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে।

তবু প্রথমটা নরেন্দ্রনাথ অত গ্রাহ্য করেন নাই—যদিও তিনি এই বয়সেই সত্যের জন্য, যথার্থ ধর্ম্মমতের জন্য উদ্‌গ্রীব। অবশেষে রামচন্দ্র দত্ত নামে ঠাকুরের এক ভক্ত জোর করিয়া নরেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর এবার নরেনকে বলিলেন, 'তুই এতদিন কেমন করে ভুলে ছিলি রে? আমি যে তোর পথ চেয়েই বসে আছি।'

ইহার পর নরেন্দ্র এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে। মধ্যে মধ্যে না গিয়া থাকিতে পারেন না। তবু তিন

বৎসর ধরিয়া ইতস্ততঃ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি টান্ খুব বেশী অথচ এই লোকটির মত এমন করিয়া ত সেখানে কেহ বলে না যে, 'ঈশ্বরকে আমি জানি, তাঁহাকে দেখিয়াছি—যেমন এই তোমাকে দেখিতেছি।'

ইতিমধ্যে বিশ্বনাথবাবু মারা গেলেন। অত টাকা রোজগার করিলেও খরচা ছিল খুব। কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এখন আবার বসত বাটিটীও জ্ঞাতিরা গ্রাস করিতে চাহিলেন। নরেন্দ্রনাথ বহুকষ্টে তাহা রক্ষা করিলেন। এসময়ে তাঁহার দুর্দ্দশার শেষ ছিল না—কোনদিন আহার জুটিত, কোনদিন তাও জুটিত না। রামকৃষ্ণ একদিন বলিলেন, 'তুই যদি মার কাছে ( মা কালীর কাছে ) টাকা চাইতে পারিস ত পাবি।' কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মার কাছে তুচ্ছ টাকাকড়ি চাহিতে পারিলেন না।

ইহার মধ্যে একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ মারা গেলেন। ঠাকুর তাঁহাকে ভার দিয়া গেলেন—ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করা, সেবাব্রতে মানুষের দৃষ্টি ফেরানো—জাতিকে, দেশকে জাগাইয়া

তোলার। নরেন্দ্রনাথ তপস্যা শুরু করিলেন। নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ বা স্বামীজী বলিয়া পরিচিত হইলেন।

অনেকদিন তপস্যা করিবার পর স্বামীজী পরিব্রাজকরূপে সারা ভারত ঘুরিয়া বেড়াইলেন। এসময় দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না, কৌপীন কমণ্ডলু মাত্র সম্বল। ট্রেনভাড়া জুটিল ত ভাল—নহিলে হাঁটিয়াই পাড়ি দিতেন। এসময় তাঁহাকে সাধারণ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলিয়া অনেকেই প্রথমটা অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু পরে ভুল ভাঙ্গিয়া যাইতে সকলেই মাথা নোয়াইয়াছে। খেতরি, লিমড়ি, আলোয়ার, রামনাদ, মহীশূর প্রভৃতি দেশীয়রাজ্যের রাজারা ও দেওয়ানগণ তাঁহার শিষ্যত্বই গ্রহণ করিলেন। বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতের লোকেরা তাঁহার পরমভক্ত হইয়া উঠিল। ভিখারী সন্ন্যাসী অনর্গল ইংরাজীতে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছেন —এমনটি আর পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই।

এই সময় চিকাগোতে একটি ধর্ম্ম মহাসম্মেলন আহূত হয়। সব ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতেই যাজক-মণ্ডলী প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন—কিন্তু

হিন্দুধর্ম্মে ত তেমন কেহ নাই। কে কাহাকে প্রেরণ করিবে? মাদ্রাজ বোম্বাই হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের ভক্তরা স্বামীজীকে অনুরোধ করিল হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি হইয়া যাইতে। তাহারাই টাকাকড়ি চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করিল।

চিকাগোতে স্বামীজী এমনই বক্তৃতা করিলেন যে ওখানের সকল প্রতিনিধিরা ত বটেই—সমগ্র আমেরিকার লোক মুগ্ধ হইয়া গেল। সকলে তাঁহাকে ঈশ্বর-জানিত পুরুষ বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। চিকাগো হইতে ফিরিবার পর এদেশেও সর্ব্বত্র তাঁহার অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনার ঢেউ বহিয়া গেল। এই সুযোগে স্বামীজী তাঁহার সেবাধর্ম্মের কাজ শুরু করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইল। সেখানের সন্ন্যাসী ও নিবেদিত-প্রাণ ব্রহ্মচারীদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে মানুষের সেবা—স্বামীজী এই নির্দ্দেশ দিলেন।

অনেকে তাহাতে প্রথমটা খুবই অবাক হইয়া গিয়াছিল। এ আবার কি কথা? সন্ন্যাসী-মানুষ তপস্যা করো—সংসারের কাজে জড়াইয়া পড়ার দরকার কি? কিন্তু স্বামীজী বলিলেন,

'জন্ম-জন্ম যদি ঈশ্বরকে না পাই ত তাও ভাল—তবুও ক্লিষ্ট পীড়িত মানুষের সেবা ত্যাগ করিয়া গুহায় বসিয়া তপস্যা করিতে পারিব না।' ঠাকুরও বলিতেন—'আগে পেট ভরে খেতে দে, মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা কর, তারপর ধর্ম্মের কথা শোনাস্। খালি পেটে ধর্ম্মরক্ষা হয় না।'

স্বামীজীর মূল মন্ত্র ছিল—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

কঠোর পরিশ্রমে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। শরীরের দিকে ত স্বামীজী কখনও তাকান নাই! তাই অত্যন্ত অল্পবয়সেই ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ক্লান্ত বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিলেন।

তোমরা বড় হইয়া তাঁহার জীবনী ও লেখা বই নিশ্চয়ই পাঠ করিবে। এই বইতে তাঁহার জীবনী হইতে কয়েকটি ঘটনা এবং তাঁহার মুখে বলা কয়েকটি গল্প শুনাইব।

# যথার্থ শিক্ষা

পুরাকালে ছাত্ররা গুরুগৃহে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। গুরুর সেবা করিয়া, সময়ে সময়ে সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া গুরুকে খুশী করিত। তাহার বদলে গুরু যত্ন করিয়া তাহাকে লেখা-পড়া শিখাইতেন। তখনকার দিনে গুরু কোন বেতন লইতেন না, বরং শিষ্যের আহারাদির ব্যয়ও তিনি বহন করিতেন। শিষ্যেরা অবশ্য শিক্ষা শেষ হইলে সাধ্যমত দক্ষিণা দিত, কিন্তু সে দক্ষিণা খুব সামান্য হইলেও গুরুরা অসন্তুষ্ট হইতেন না।

একবার এক ভদ্রলোক এমনিই এক গুরুগৃহে তাঁহার ছেলেকে পাঠাইয়াছিলেন। ছেলেটি কিছুদিন গুরুগৃহে থাকিয়া একসময়ে তাহার পাঠ সমাপ্ত করিয়া খুব উৎফুল্লচিত্তে বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রশ্ন করিলেন,

বৎস, তোমার পাঠ ইহারই মধ্যে শেষ হইয়া গেল ?

আজ্ঞে হাঁ।

কি কি শিখিলে ? পিতা প্রশ্ন করিলেন।

বৎস, তোমার পাঠ ইহারই মধ্যে শেষ হইয়া গেল ?

আজ্ঞে, তা অনেক শিখিয়াছি। কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন—

ছেলেটির বাবা বাধা দিয়া বলিলেন, বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। তোমার শিক্ষা এখনও কিছুই

হয় নাই, ঢের বাকী। তুমি ফিরিয়া যাও, মন দিয়া পড়াশুনা করো গিয়া।

ছেলেটি ম্লানমুখে পুনরায় গুরুগৃহে ফিরিয়া গেল। সে বুঝিতেই পারিল না তাহার বাবা কেন এমন আচরণ করিলেন! গুরু ত ইচ্ছা করিয়া খুশী হইয়াই বিদায় দিয়াছিলেন। তবে?

যাহা হউক—আরও কিছুদিন গুরুগৃহে কাটাইবার পর ছাত্র আবার বাড়ী ফিরিল। এবার সে গুরুর কাছ হইতে উপাধিপত্র লইয়া আসিয়াছে। পাঠ সম্পূর্ণ শেষ হইলে যে উপাধি পাওয়া যায়—সেই উপাধি! এবার আর বাবা নিশ্চয়ই কিছু বলিতে পারিবেন না।

কিন্তু এবারেও পিতাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে তিনি সেই প্রশ্ন করিলেন, লেখাপড়া শেখা শেষ হইল?

ছেলে উৎফুল্ল মুখে বলিল, হাঁ বাবা। সব পড়াশুনা শেষ করিয়া আসিয়াছি। দেখুন না, সব কয়টি বিষয়েই পাঠ সমাপ্ত করিয়া উপাধি পাইয়াছি।

তবুও বাবা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িলেন,

এখনও ঠিক হয় নাই বৎস। আরও কিছুদিন গুরুগৃহে থাকিয়া এসো।

ছেলের মাথায় ত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ আবার কি কথা ? গুরু বলেন হইয়া গেছে—বাবা বলেন, না। তবু বাবার কথা ত অমান্য করা যায় না—সে আবার গুরুগৃহে ফিরিয়া গিয়া সব কথা বলিয়া বিনীতভাবে প্রশ্ন করিল, গুরুদেব, এখনও কি আমার পাঠ কিছু বাকী আছে ?

তা' আছে বৈ কি বৎস! শিক্ষার কি আর শেষ আছে ? হাসিয়া গুরুদেব উত্তর দিলেন।

তবে আপনি যে উপাধি দিলেন ?

মোটামুটি ছাত্রের পক্ষে যতটা শেখা প্রয়োজন, ততটা শেষ হইলেই আমরা উপাধি দিই।

ছাত্রের ভুল ভাঙ্গিল। এবার কিছু বেশীদিন গুরুগৃহে থাকিয়া সে বাড়ী ফিরিল। তখন আর ততটা উৎফুল্ল বা নিশ্চিন্ত ভাব নাই, বরং যেন কিছু গম্ভীর।

কেমন সব শেখা হইল ? পিতা প্রশ্ন করিলেন।

সব শেখা হইল কেমন করিয়া বলি বাবা? ছেলে উত্তর দিল, তবে মনে হয় এবার অনেকটা হইয়াছে।

বাবা বেশ নিশ্চিন্ত মনে শান্তকণ্ঠে কহিলেন, বেশ ত! বাড়ীতে ত এমন কিছু তাড়া নাই, যাও—বাকীটুকু শেষ করিয়া এসো।

এবার ছেলে ফিরিল বহুদিন পরে। পিতাকে প্রণাম করিয়া নতমুখে দাঁড়াইল।

বাবা প্রশ্ন করিলেন, কেমন বাবা—শিক্ষা সমাপ্ত হইল?

শিক্ষা শেষ হওয়া সম্ভব নয় বাবা। সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি। এতদিনে এইটুকু বুঝিয়াছি যে জ্ঞান বা বিদ্যাচর্চ্চার শেষ নাই। শাস্ত্রও অফুরন্ত।

এবার বাবার খুশী হইবার পালা। তিনি হাসিমুখে বলিলেন, যাক সব চেয়ে বড় শিক্ষাটাই যখন হয়ে গেছে, তখন আর চিন্তা নাই। আর তোমাকে গুরুগৃহে যাইতে হইবে না—তুমি বাড়ীতে থাকিয়াই বাকী পড়াশুনা করো।

যথার্থ বিদ্যালাভ যাঁদের হয় তাঁহারা বিনয়ী হন—যিনি অল্প শেখেন তাঁহারই মনে অহঙ্কার হয় যে অনেক শিখিলাম। কলসী ভরিবার সময় শব্দ করে, ভরা হইয়া গেলে শান্ত হয়। তেমনি বিদ্বানরাও বৃথা অহঙ্কার বা নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রচার করেন না। কারণ তাঁহারা জানেন সত্যই শিক্ষার শেষ নাই। মহামতি নিউটনও বলিয়াছিলেন—'আমি শুধু জ্ঞানসমুদ্রের তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছি, সমুদ্র যেমন তেমনি পড়িয়া আছে।'

## কাজের লোক

একটি বাবুর দুটি মালী ছিল। একটি মালী যথার্থই ভাল মানুষ—পরিশ্রমী ও সৎ। আর একটি কুড়ের বাদশা একেবারে, সে কেবল ভাবে কেমন করিয়া বিনা পরিশ্রমে ফাঁকি দিয়া মাহিনাটা লইবে। সে মোটেই কাজের ধারে ঘেঁষিত না—প্রথম মালীটি যখন কাজ করিয়া মরিত, সে তখন দিব্যি খাটিয়ায় পড়িয়া নাক ডাকাইত।

বিরাট বাগান, সেই জন্যই দুটি মালী রাখা; সেক্ষেত্রে একজন যদি কিছুই না করে ত অপরের দ্বিগুণ মেহনৎ হয়। প্রথম মালীটির খাটুনির

শেষ থাকে না একেবারে ; মাটি কোপানো, সার দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, কুয়া হইতে জল তুলিয়া দেওয়া—মায় ফল পাকিলে পাড়িয়া দূরের হাটে বিক্রী করিয়া আসা, সবই তাহাকে করিতে হয়। আর এধারে বাবু যখন বাগান দেখিতে আসেন তখন দ্বিতীয় মালীটি তাঁহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া বিষম লম্ফ-ঝম্ফ করে! প্রথমেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। মুখে মুখে লম্বা কাজের হিসাব দেয়, কত রকম অসুবিধা সত্ত্বেও যে সে কাজ করিয়া যাইতেছে তাহারই মিথ্যা ইতিহাস শোনায়। কিন্তু তাহাতেও ঠিক নিশ্চিন্ত না হইয়া সে অনর্থক তোষামোদ করে বাবুর। যে-সব গুণ তাঁহার নাই সে-সব গুণও আরোপ করিয়া খুব স্তুতিগান করে,—বাবু অমুক, বাবু তমুক, বাবু সাক্ষাৎ মহাদেব, এমন বুদ্ধিমান আর নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম প্রথম বাবু এই তোষামোদে খুশী হইয়া দ্বিতীয় মালীকেই বকশিশ করিতেন, তাহার মাহিনা বাড়াইয়া দিতেন।

তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার খেয়াল হইল যে, যথার্থ কাজের লোক যাহারা, তাহারা ত

তোষামোদ করে না। এ লোকটা এমন গায়ে পড়িয়া তোষামোদ করে কেন? তবে কি এ ফাঁকি দেয়?

প্রথমেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে

তিনি দুই একদিন পথে প্রথম মালীকে হাটে যাইতে দেখিলেন। তখন মনে হইল, কৈ দ্বিতীয়

মালী ত যায় না। আর একদিন দেখেন সার দিবার জন্য একবোঝা খোল বহিয়া আনিতেছে প্রথম মালী।

ইহার পরে তিনি যখন বাগানে যাইতেন তখন দ্বিতীয় মালীকে প্রশ্ন করিতেন, সে কোথায় ?

দ্বিতীয় মালী মিথ্যা বলিতে পারিত না। যদি সে বলে যে 'অমুক জায়গায় হয়ত বসিয়া আছে' কিংবা 'কোথাও পড়িয়া ঘুমাইতেছে' তাহা হইলে বিপদ ঘটিতে পারে। অলস ও অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া প্রথম মালীকে হয়ত তিনি জবাব দিবেন। এ যদি যায়. নতুন আসিবে। সে যদি এত ভাল-মানুষ না হয়, মুখ বুজিয়া খাটিতে না চায় ?

অগত্যা তাহাকে বলিতে হইত, 'অমুক হাটে ফল বেচিতে গিয়াছে' কিংবা 'ঘাষ নিড়াইতেছে' নয়ত 'জল দিতেছে।' অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বলিত, আমি এতক্ষণ দিয়া আসিলাম, এবার ওর পালা।

কিন্তু বাবু তার হাত-পা লক্ষ্য করেন—সর্ব্বদাই পরিষ্কার থাকে। বাগানে যে এইমাত্র খাটিয়াছে তাহার অমন হইতেই পারে না। তখন শুরু করিলেন হঠাৎ হঠাৎ আসিতে। যখনই

আসেন, দেখেন প্রথম মালী খাটিতেছে আর দ্বিতীয় মালী বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিলেই সে ছুটিয়া আসিয়া লম্ফ-ঝম্ফ হাঁক-ডাক করে বটে কিন্তু আসল কথাটা তাঁহার বুঝিতে বাকী থাকে না।

এইভাবে কয়েকদিন দেখিয়া বাবু দ্বিতীয় মালীকে একদিন জবাব দিলেন এবং প্রথম মালীর মাহিনা বাড়াইয়া দিলেন। অত তোষামোদ এবং চালাকি শেষ পর্য্যন্ত কোন কাজেই আসিল না।

চালাকির দ্বারা শেষ অবধি কার্য্য উদ্ধার হয় না, সত্য গোপন করাও যায় না। প্রকৃত কাজের লোক যে, সে কখনও নিজের কাজের কথা ঢাক পিটাইয়া বেড়ায় না—পরের তোষামোদও করে না। হয়ত প্রথম প্রথম তাহার কিছু অসুবিধা হইতে পারে, ফাঁকিবাজ লোক নিজের সুবিধা করিয়া লইয়া কাজের লোককে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু পরিণামে যোগ্যতারই পুরস্কার পাওয়া যায়। চিরদিন লোককে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়।

# উপস্থিত বুদ্ধি

মহীশূরের মহারাজা স্বামীজীর বড় ভক্ত ছিলেন। একদিন কথায় কথায় তিনি হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, দেখুন, আমি হিন্দুদের এই মূর্ত্তি-পূজা ব্যাপারটাকে মোটে বিশ্বাস করি না। ইহাতে কি আমার পাপ হয় ?

স্বামীজী মহারাজের চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি আমাকে ঠাট্টা করিতেছেন ?

না স্বামীজী, সত্যই আমার কাছে ইহা খারাপ ঠেকে। ভক্তি করিব কাকে ? মাটি, পাথর না ধাতুর ঢেলা ? এছাড়া ত আর কিছু নয়। আমার কিছুতেই ভক্তি আসে না। ইহার জন্য কি আমার পরলোকে সাজা হইবে ?

স্বামীজী শান্ত ভাবেই উত্তর দিলেন, না, তা কেন হইবে ? যার যা বিশ্বাস। আপনি আপনার বিশ্বাসমত ঈশ্বরকে ডাকিবেন।

সকলে ত অবাক। স্বামীজী নিজে প্রতিমার সামনে মাটিতে লুটাইয়া প্রণাম করেন, ঠাকুরের

সামনে ভজন গাহিতে গাহিতে অজ্ঞান হইয়া যান —অথচ উনি মহারাজকে মূর্তিপূজার পক্ষে একটিও যুক্তি দিতে পারিলেন না? উঁহার মত পণ্ডিত লোক এখনই ত বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। এ কী হইল!

কিন্তু সে উত্তর আসিল একটু পরেই।

আরও দুই-এক কথার পর সহসা স্বামীজী দেওয়ালে টাঙ্গানো মহারাজার একখানা ছবি দেখাইয়া দেওয়ানজীকে বলিলেন, ওটা পাড়িয়া আনুন ত!

তাড়াতাড়ি একজন ছুটিয়া গিয়া ছবিটা লইয়া আসিল।

স্বামীজী ছবিটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দেওয়ানজীকে কহিলেন, আপনি ইহার উপর থুতু ফেলুন।

দেওয়ানজী জিভ্ কাটিয়া সভয়ে পিছাইয়া আসিলেন। সে কি কথা, তাও কি হয়! ও যে মহারাজার ছবি!

কী হইল? পারিলেন না?

দেওয়ানজী ঘাড় নাড়িলেন প্রবলবেগে। না, তাঁহার দ্বারা সম্ভব নয়।

আপনারা কেহ পারেন না কি? যে কেহ একজন আসুন ত, এমন কিছু কঠিন কাজ নয়—একটা ছবির উপর একটু থুতু ফেলা।

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন, ভয়ে ভয়ে মহারাজার দিকে চান। এ সন্ন্যাসীকে এই কথা বলার জন্যই সাজা দেওয়া উচিত কিনা ভাবিয়া পান না। শেষ পর্য্যন্ত একজন বলিলেন, সে কি সম্ভব স্বামীজী, ও যে মহারাজের ছবি!

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, মহারাজ ত ঐ আপনার সামনে বসিয়া। এটা আবার মহারাজ কি? এক টুকরা কাগজের উপর খানিকটা কালি মাখানো বৈ ত নয়! এমন কত কালি-মাখানো কাগজই ত পৃথিবীতে আছে!

তবুও সকলে নীরব।

কি আশ্চর্য্য! ছবিখানা কথাও বলে না, মহারাজের মত চালতেও পারে না। থুতু ফেলিলে প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিবে না—তবে আর ভয় কি?

তারপর হাসিয়া বলিলেন, আপনারা যে কেহ এ কাজ পারিবেন না তা জানি। এ ছবি মহারাজ

আপনি এর উপর থুতু ফেলুন

না হইলেও ইহাতে থুতু ফেলা মানেই মহারাজকে অসম্মান করা। কেমন কিনা ?

সকলেই সায় দিলেন। এতক্ষণে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন সকলে।

তখন স্বামীজী মহারাজকে কহিলেন, দেখুন মহারাজ, ছবিখানি আপনি নয়, তবু আপনার সেবকরা কেহই ছবিখানিকে অমর্য্যাদা করিতে সাহস করিলেন না, তার কারণ আপনার ছবিকে আপনারই প্রতীক হিসাবে দেখেন, খালি সামান্য কাগজ বলিয়া মনে করেন না। তেমনি দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্য দিয়া সাধক সেই ঈশ্বরকেই ভজনা করে।

সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার মধ্যে বুদ্ধির অহঙ্কারই মানুষকে বিপথে ঠেলিয়া দেয় বেশী, মানুষের নির্ম্মল বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে।

## পাশার দান

একটি গরীব চাষী খুব মন দিয়া সূর্য্যদেবতার পূজা ও উপাসনা করে। এমন ভাবে একমনে সে প্রত্যহ পূজা করিত যে দেবতা খুশী না হইয়া

পারিলেন না। তখন একদিন তিনি উহাকে দেখা দিলেন এবং বলিলেন, বৎস, তোমার পূজা-অর্চ্চনায় খুব খুশী হইয়াছি, তুমি বর চাও।

চাষী ঠিক এতটা আশা করে নাই, সে ভাবিয়াই পাইল না কী বর চাহিবে।

খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, দাঁড়াও ঠাকুর, ভাবিয়া দেখি। নয় ত বৌকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।

দেবতা হাসিয়া কহিলেন, আমি ত অতক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না। বরং এক কাজ করো। এই পাশাটি লও, যে কোন ইচ্ছা করিয়া এই পাশাটি ফেলিবে সেই ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে—এই রকম তিন বার পর্য্যন্ত চাহিতে পারিবে। অর্থাৎ তিনটি বর তোমাকে দিয়া গেলাম।

দেবতা অন্তর্দ্ধান করিলেন।

চাষী ত মহাখুশী। একরকম নাচিতে নাচিতেই সে বাড়ী ফিরিল।

তাহার বৌ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ব্যাপার কি? আজ মাঠ হইতে কী এমন ধন-দৌলত লইয়া ফিরিলে?

চাষী তখনই কথাটা ভাঙ্গে না। বলে ধন-দৌলত কি, সে ত তুচ্ছ জিনিষ, তার চেয়ে ঢের বেশী।

চাষী তাহার হাত ধরিয়া সব কথা খুলিয়া বলিল

ধনদৌলতের চেয়েও বেশী? এমন জিনিষ আছে নাকি? চাষীর বৌ ভাবিল, দুঃখে-কষ্টে

লোকটার মাথা খারাপ হইয়া গেছে।

সে রাগ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া চাষী তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া সব কথা খুলিয়া বলিল। বৌ ত প্রথমে বিশ্বাসই করে না, তারপর যখন পাশাটি দেখিল তখন আর বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি?

সে খুশী হইয়া বলিল, বেশ হইয়াছে, এখন তাহা হইলে অনেক করিয়া ধনদৌলত চাহিয়া লও।

চাষী রাগ করিয়া বলে, তোর ঐ এক কথা, কেবল ধনদৌলত! সে-সব ধীরে-সুস্থে হইবে এখন। তোর আর আমার দুজনেরই নাক খাঁদা, কেবল যা-তা বলিয়া লোকে ঠাট্টা করে। আগে ভাল নাক দুটি চাহিয়া লই।

চাষীর বৌ ত অবাক! এত জিনিষ থাকিতে নাক? পাগল নাকি!

সে স্পষ্টই বলে মুখের উপর, নাক লইয়া কি হইবে? টাকাপয়সা চাও, যাহাতে দুঃখ না থাকে। রোজ রোজ আর এই খাওয়া-পরার কষ্ট সহ্য হয় না।

কিন্তু চাষীর ঝোঁক নাকের উপর। অথচ বৌ চায় টাকা। দুজনে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। এ বলে, লোকে যাহা লইয়া এত গঞ্জনা দেয় সেইটা ঠিক করিয়া লই—লোকে জব্দ হোক। ও বলে, টাকা হইলে আপনিই সবার মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে, কেহ আর ঠাট্টা করিতে সাহস করিবে না।

চাষী একে গোঁয়ার, তায় সে-ই পাশাটা রোজগার করিয়া আনিয়াছে, সে নিজের জিদ ছাড়িবে কেন? সে চটিয়া-মটিয়া পাশাটা জোর করিয়া মাটিতে ফেলিয়া কহিল, আমাদের কেবল নাক চাই, আর কিছু না।

ব্যস্। যেমন না বলা, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দুজনেরই সর্ব্বাঙ্গে রাশি-রাশি হাজার-হাজার নাক বাহির হইয়া গেল, তিল ধারণের মত কোন স্থান খালি রহিল না।

সর্ব্বনাশ!

চাষীর বৌ ত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। চাষীও হত-ভম্ব। শেষে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, আচ্ছা, সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিতেছি।

সে পাশাটা আর একবার ফেলিয়া কহিল, আমাদের সব নাক চলিয়া যাক্।

সঙ্গে সঙ্গেই সব নাক গেল বটে—কিন্তু সবই গেল। অর্থাৎ নিজেদের থাঁদা নাক সুদ্ধ, শুধু একটা করিয়া গর্ত্ত রহিল নাকের জায়গায়।

এবার চাষীর বৌ রাগে-দুঃখে মাটিতে মাথা খুঁড়িতে শুরু করিল। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় চাষীরও গালে-মুখে চড়াইতে ইচ্ছা হইল।

তা ত হইল, এখন উপায় কি ?

চাষী বলিল, ধনদৌলতে কাজ নাই, একটি করিয়া সুন্দর নাক চাহিয়া লই।

বৌয়ের বেশী বুদ্ধি, সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু, তা হইবে না। সবাই জানে আমাদের থাঁদা নাক, এখন যদি ভাল নাক লই ত সকলে অবাক হইয়া যাইবে, প্রশ্ন করিবে এ কেমন করিয়া হইল, তখন সব কথা বলিতে হইবে, আর বেকুবি ধরা পড়িয়া যাইবে। চিরকাল তোমার বোকামির জন্য গঞ্জনা সহিতে হইবে। তার চেয়ে, কাজ নাই—বলো, যেমন নাক ছিল তেমনই ফিরিয়া আসুক।

আবারও পাশা পড়িল—ঠাকুর, যেমন নাক ছিল তেমন আস্থক।

নাকও আসিল, পাশাও অদৃশ্য হইয়া গেল। তিন বরই কাবার!

মানুষের বাসনার শেষ নাই—ছোট ছোট বাসনার জন্য মানুষ অনেক সময় নিজের পক্ষে যাহা শ্রেয়, তাহাকেও হারাইয়া বসে। সুযোগ আসিলেও, স্থির বুদ্ধির অভাবে সে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না।

# যার যা অভ্যাস

বহুদূরের হাট। দুইখানা গ্রাম ডিঙ্গাইয়া, তিনটা মাঠ পার হইয়া তবে বাড়ী ফিরিতে হয়। নদীর ধারেই মেছুনীদের বাড়ী। সারারাত মাছ ধরে পুরুষেরা, ভোরের দিকে সেই মাছ আনিয়া মেয়েদের হাতে দেয়—তাহারা রাত বাকী থাকিতেই উঠিয়া মাছের ঝুড়ি মাথায় করিয়া হাঁটিতে শুরু করে। সময় থাকিতে হাটে গিয়া পৌঁছিতে হইবে। গ্রাম-গ্রামান্তরের হাট। সব

গ্রামে ত প্রত্যেক দিন হাট হয় না, আজ এখানে কাল ওখানে যাইতে হয়। ফলে, দূরে যেদিন গিয়া পড়ে, সেদিন ফিরিতে সন্ধ্যা হয়। বেচাকেনা শেষ করিয়া একটু বিশ্রামের পর তবে আবার পথ চলা —কত পথ কত মাঠ ডিঙ্গাইয়া আসা, সাধারণ কথা ত নয়। কোন কোন দিন রাতও হইয়া যায়।

একদিন এমনি এক সন্ধ্যায় ফিরিবার পথে প্রবল ঝড়জল নামিল। কি বিষম দুর্য্যোগ— আর তেমনি বাতাসের বেগ, মাঠের উপর দিয়া হাঁটা যায় না, মনে হয় উড়াইয়া লইয়া যাইবে; আবার বনের পথে বা গ্রামের পথে চলিতেও ভয় হয়—বড় বড় গাছ যেভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কখন কোন্‌টা মাথায় পড়িবে তার ঠিক কি ?

মেছুনীর দল হঠাৎ এই দুর্য্যোগে দিশাহারা হইয়া পড়িল,—কোথায় যায় ? কোনমতে খানিকটা ছুটাছুটি করিয়া এক সময়ে এক মালিনীর বাড়ীর দরজার কাছে পৌঁছিল। কপাটে করাঘাত করিতেই মালিনী আসিয়া দোর খুলিয়া দিল। উহাদের অবস্থা দেখিয়া তাহার দুঃখের

আর সীমা রহিল না, আহা-হা! এমন করিয়াও মানুষ ভেজে! এস এস বাছারা, ভিতরে এসো।

ঘর ছোট নয় খুব, তবু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—নিকানো মুছানো। সে ঘরে মাছের চুবড়ি লইয়া ঢুকিতে লজ্জা করে। উহারা ঝুড়িগুলি ঘরের

একটি মেছুনী উঠিয়া বলিল, মালিনী মা, এত ফুলের গন্ধে আমাদের ঘুম হইবে না।

বাহিরে রাখিয়া ঢুকিল; বাঁশের ঝুড়ি তা ভিজিলে ক্ষতি নাই।

মালিনী খুব যত্ন করিল, শুকনা কাপড় দিল,

মাথা মুছিবার গামছা দিল, জলখাবার খাইতে দিল চিঁড়া-মুড়কি লাড়ু। তখনও আশা ছিল যে জল থামিবে, কিন্তু রাত্রি যখন খুব গভীর হইল, অথচ দুর্যোগ থামিল না, তখন মালিনী বলিল, আর অপেক্ষা করিয়া কাজ নাই, বাছারা শুইয়া পড়ো। এ জল আর আজ রাত্রে থামিবে না।

সে একটা বড় চাটাই পাতিয়া দিল, তাহাতেই মেছুনীরা পাশাপাশি শুইয়া পড়িল।

মালিনী বড়লোকের বাড়ী ফুল জোগায়, রাজবাড়ীতে মালা ফুল ভোর বেলাতেই জোগান দিতে হইবে। সুতরাং সে সন্ধ্যাবেলাই আধফোটা কুঁড়ি ফুল সংগ্রহ করিয়া রাখে, সন্ধ্যায় বসিয়া গুঞ্জমালা গাঁথে। চারিদিকেই ফুল—বেল, জুঁই, রজনী-গন্ধা—থরে থরে সাজানো। গন্ধে ঘরের বাতাস যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে গন্ধ মেছুনীরা সহিতে পারিবে কেন? চিরকাল ভিজা জাল এবং মাছের ঝুড়ির আঁশটে গন্ধের মধ্যে শোওয়া অভ্যাস। এত ভাল গন্ধে তাহাদের মাথা ধরিয়া ওঠে, কিছুতেই ঘুম হয় না—কেবল এপাশ-ওপাশ করে।

শেষে একসময় একটি মেছুনী উঠিয়া বলিল, মালিনী মা, এত ফুলের গন্ধে আমাদের ঘুম হইবে না, যদি অনুমতি দাও ত একটা মাছের ঝুড়ি মাথার কাছে আনিয়া রাখি।

মালিনীর আর কি আপত্তি? সে তখনই অনুমতি দিল।

তখন তাহারা একটা মাছের ঝুড়ি মাথার কাছে আনিয়া রাখিয়া সেই গন্ধে সুখে ঘুমাইয়া পড়িল।

খারাপ কাজ ও চিন্তায় যাহারা ডুবিয়া থাকে তাহারা সৎচিন্তা বা সৎকার্য্য সহিতে পারে না। যে সূর্য্য সমস্ত-কিছুকে প্রাণ জোগায়, পেঁচা প্রাণপণে সেই সূর্য্যকেই এড়াইয়া চলে।

# কূপমণ্ডূক

একটা কুয়াতে একটি ব্যাঙ থাকিত। তাহার ঐ কুয়াতেই জন্ম, জন্মাবধি ঐ কুয়াই সে দেখিতেছে। দেড়হাত চওড়া সংকীর্ণ পাতকুয়া—

তাহার উপরে সামান্য একফালি আকাশ। ইহার বাহিরে যে আর কোন দেশ আছে বা জলাশয় আছে—এ ধারণা তাহার ছিল না। তাহার জগৎ সম্পূর্ণ ঐ কুয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

একবার কি করিয়া একটি সাগরের ব্যাঙ ঐ পথে আসিয়া কুয়ার মধ্যে পড়িয়া যায়। কুয়ার ব্যাঙ যে, তাহার ত আর বিস্ময়ের সীমা নাই, আরও ব্যাঙ আছে নাকি পৃথিবীতে? কি আশ্চর্য্য! তাহার একটু রাগও হইল, এ আপদ আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল।

যাহা হউক, রাগের চেয়ে বিস্ময়টাই বেশী। সে কুয়ার মধ্যে এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত খুব খানিকটা লম্ফঝম্প করিয়া অবশেষে বলিল, তুমি আবার কোথা হইতে আসিলে বাপু!

সাগরের ব্যাঙ খুব বিনয়ী। সে বিনীতভাবেই বলিল, আজ্ঞে, সাগর হইতে আসিয়াছি।

সাগর? সেটা আবার কি?

সে-ও একটা জলাশয়। সাগরের ব্যাঙ হাসিয়া জবাব দেয়।

ও, তাই নাকি? আরও জলাশয় আছে?

সে কি, সাগর যে বিরাট বড় জলাশয়। আপনি কি জানেন না ?
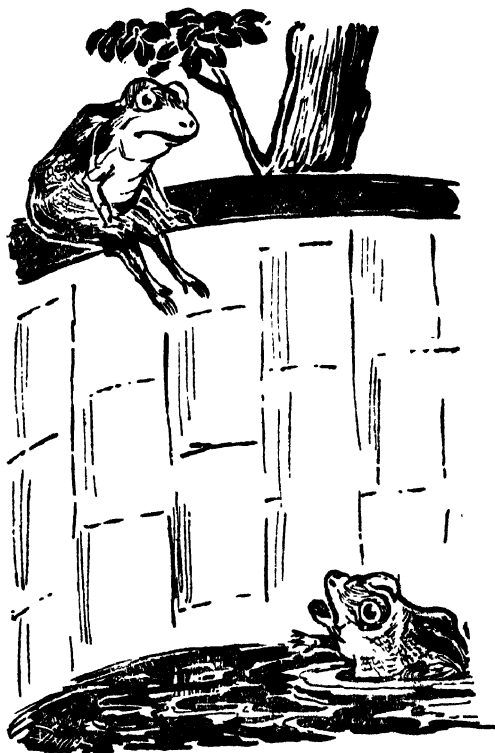
হা-হা করিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিল কুয়ার ব্যাঙ।

বিরাট বড় জলাশয় ? উঃ, বড় ত কত! ইহার চেয়ে বড় আছে নাকি ?

সে আর একবার সব কুয়াটা লাফাইয়া ঘুরিয়া আসিল।

সাগরের ব্যাঙ আর কি বলিবে, সে চুপ করিয়াই আছে।

খানিকটা পরে কুয়ার ব্যাঙই পুনরায় বলিল, তা, ইহার সিকি হইবে সাগরটা ?

আপনি কি পাগল হইয়াছেন ! সাগর অনেক বড়।

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কুয়ার ব্যাঙ বলিল, কত আর বড়, ইহার অর্দ্ধেক ?

তার চেয়ে ঢের বেশী !

তা বলিয়া ত আর এত বড় নয়। সগর্ব্বে বলে কুয়ার ব্যাঙ।

এ কুয়ার চেয়ে ঢের ঢের বেশী বড়। এমন কত লক্ষ কুয়া তাহার মধ্যে আছে।

হা-হা করিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিল কুয়ার ব্যাঙ, তুমি কি আমাকে বোকা পাইয়া তামাসা করিতেছ ? ইহার চেয়ে বড়, সেও কি সম্ভব ? চুপ করো, চুপ করো—লোক হাসাইও না।

সে কিছুতেই বিশ্বাস করিল না যে, কুয়ার চেয়ে বড় জলাশয় থাকা সম্ভব।

যাহারা দুনিয়ার কোন খবর রাখে না, পড়াশুনা করে না, তাহারা নিজেদের অজ্ঞানতা ও অশিক্ষার মধ্যেই সুখে থাকে। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া ভাবে, এর চেয়ে বড় আর কিছু নাই।

## শিশুদের মন

এক বিধবা ব্রাহ্মণীর একটি ছেলে ছিল। ব্রাহ্মণী বড় গরীব, এমন সঙ্গতি নাই যে বেতন দিয়া কোথাও লেখাপড়া শেখান, অথচ ব্রাহ্মণের ছেলে মূর্খ হইয়া থাকিবে তাই বা কেমন করিয়া হয়? তিনি পাঁচজনের কাছে দুঃখ জানাইতে জানাইতে, গ্রামান্তরের এক পাঠশালার পণ্ডিত ছেলেটিকে বিনা বেতনে পড়াইতে রাজী হইলেন।

পাঠশালা তখনকার দিনে সকালে বিকালে বসিত, এখনও বসে কোন-কোন জায়গায়। এ গ্রাম হইতে ভিন্ন গ্রামে যাইতে অনেক সময় লাগে, সুতরাং বালকটিকে এধারেও রাত থাকিতে উঠিয়া যাইতে হইত, ওধারেও ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত।

অবশ্য তাহাতে এম্‌নি কোন ক্ষতি হইবার কথা নহে, কিন্তু বালকটির নিজ গ্রাম ও পাঠ-শালার পথের মধ্যে ভীষণ একটি জঙ্গল পড়িত। শেষরাত্রে বা সন্ধ্যায় ঐ জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সেই নিবিড় অন্ধকার এবং কালো কালো গাছ-গুলির দিকে চাহিয়া তাহার গা ছমছম করিত।

দিনকতক এইভাবে যাতায়াত করিয়া বালকটি একদিন মাকে বলিল, মা বনের মধ্য দিয়া যাইতে বড় ভয় করে, একজন লোক দিতে পারো সঙ্গে ?

মার চোখে জল আসিল। তিনি মনের দুঃখ গোপন করিয়া বলিলেন, আমরা যে বাবা বড় গরীব, লোক রাখিতে গেলে মাহিনা দিয়া রাখিতে হয়, সে পয়সা কোথায় পাইব ? তবে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই—ঐ বনেই তোমার রাখালদাদা আছেন, কোন বিপদে পড়িলে তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন।

বালক শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ভাবিল, রাখাল নামে অপর কোন বালক আছে বোধ হয় —হয়ত তাহাদের আত্মীয়ই হইবে।

কিন্তু তাহার মা বলিয়াছেন অন্য কথা। হিন্দুদের বিশ্বাস, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একসময় গোরু চরাইতেন, সেই জন্য তিনি রাখাল বা রাখাল-রাজা। বিধবা ভগবানের কথাই বলিয়াছিলেন। গরীব, যাহাদের কেহ নাই, তাহাদের ভগবান ত আছেনই।

এধারে বালকটি কিন্তু পরের দিনই ভোরে বনের মধ্যে ঢুকিয়া মহা হাঁকাহাঁকি শুরু করিয়া দিল, রাখালদাদা, রাখালদাদা, ও রাখালদাদা!

কোন সাড়া নাই। খানিকটা ডাকাডাকি করিবার পর কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিল, ও রাখালদাদা, সাড়া দাও না কেন? আমার যে বড় ভয় করে! মা বলিয়াছে তুমি এই বনেই আছ। মা ত কখনও মিছা কথা বলেন না।

এইবার বনের মধ্য হইতে মিষ্টকণ্ঠে সাড়া আসিল, এই যে ভাই, আমি বনের মধ্যেই আছি। ভয় কি?

তুমি সামনে আসিবে না?

না ভাই—এখন বড় ব্যস্ত আছি।

সেদিনের মত নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেল বটে,

কিন্তু শীঘ্রই বালকটি তাহার রাখালদাদার দেখা পাইবার জন্য মহা পীড়াপীড়ি শুরু করিল। অগত্যা একসময় রাখাল-দাদাকে দেখাও দিতে হইল। সাধারণ যে-রকম চেহারার ছেলেরা গোরু চরায়—সেই রকম চেহারা ও বেশভূষা। বালকটি ত মহাখুশী। সে প্রত্যহ আসা-যাওয়ার পথে রাখাল-দাদার সহিত কত গল্প ও খেলা করে। আর তাহার ভয় নাই।

এধারে তাহার গুরুমহাশয়ের পিতৃবিয়োগ হইল। শ্রাদ্ধের সময় অনেক খরচ আছে—বহু লোক খাওয়াইতে হইবে, দান-ধ্যানের হাঙ্গামাও কম নাই। শ্রাদ্ধের আগের দিন গুরু মহাশয় আদেশ দিলেন, ছাত্রদের যার যা সাধ্য উপহার আনিয়া দিতে হইবে। ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে সব আলোচনা শুরু করিয়া দিল, কেহ বলিল, 'আমি টাকা দিব,' কেহ বলিল, 'ঘি যা লাগে সব আমি দিব,' কেহ বা মিষ্টান্ন আনিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিল।

বালকটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিল। তারপর ছলছল চোখে ম্লানমুখে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে সব কথা জানাইয়া বলিল, আমি

কিছু দিতে পারিব না? মাগো, গুরুমহাশয় যে তাহা হইলে অসন্তুষ্ট হইবেন!

মা চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, কি করিব বাবা, টাকা-পয়সা যে কিছুই নাই। তোমার রাখালদাদাকে ডাক, যদি তিনি কোন কিছু করিতে পারেন।

পরের দিন ভোরবেলা বালকটি আরও আগে উঠিয়া বনে গেল।

রাখালদাদা, ও রাখালদাদা!

কি ভাই?

গুরুমহাশয়ের বাবা মারা গিয়াছেন। আজ তাঁর বাবার শ্রাদ্ধ! সকলকেই কিছু কিছু দিতে হইবে। তা আমি কি দিব? মাকে বলিলাম, মা তোমাকে জানাইতে বলিয়াছেন।

রাখাল হাসিয়া বলিলেন, তা ভাই, আমি ত গোরু চরাই। আমার আর কিছু নাই দুধ ছাড়া। এই একভাঁড় দুধ লইয়া যাও—গুরুমহাশয়কে দিও। দুধের ত কাজ আছে।

এই বলিয়া তিনি একভাঁড় দুধ আনিয়া দিলেন।

বালক ত মহাখুশী। সে দুধের ভাঁড়টি সযত্নে বুকে করিয়া লইয়া গেল গুরুমহাশয়ের বাড়ী। কিন্তু সেখানে তখন মহাধূম। বহু ছেলে ভাল ভাল জিনিষ আনিয়াছে—গুরুমহাশয় সেইগুলি বুঝিয়া লইতে ব্যস্ত। বালকটির দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না—কারণ বহু পূর্ব্বেই তিনি দেখিয়া লইয়াছেন যে, ভাঁড়টি ক্ষুদ্র, বোধ হয় এক পোয়ার বেশী দুধ নাই। অত সামান্য দুধে তাঁহার কি হইবে? রাগও একটু হইল ছেলেটির উপর। বারোমাস যে বিনা বেতনে পড়ে—একটা দিন কি সে কিছু ভাল জিনিষ আনিতে পারিত না?

এধারে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া এক সময়ে বালকটি ভয়ে ভয়ে বলিল, গুরুমহাশয় এই দুধটা আনিয়াছি।

আঃ, জ্বালাতন করিল দেখছি। এই, কে কোথায় আছিস, দুধটা ঢালিয়া রাখ্। বিরক্ত হইয়া আদেশ দিলেন গুরুমহাশয়।

একটি ভৃত্য তখন খুব অবজ্ঞাভরে ভাঁড়টি বালকের হাত হইতে লইয়া দুধের কলসীতে ঢালিতে গেল। কিন্তু এ কি! দুধ একবার

ঢালিয়া ভাঁড়টা যেমন সোজা করে, দেখে যে ভাঁড় যেমন ভর্ত্তি তেমনই আছে।

ছাত্রেরা ভারে ভারে উপহার আনিতেছে

এই রকম বার পাঁচ-ছয় হইবার পর ভৃত্য আসিল মনিবের কাছে। গুরুমহাশয়ও দেখিয়া অবাক। তাড়াতাড়ি বালকটিকে ডাকিয়া বলিলেন, এ ভাঁড় তুমি পাইলে কোথায়?

বালকটি ভয়ে ভয়ে বলিল, রাখালদাদা আমাকে দিয়াছেন।

রাখালদাদা—সে আবার কে ?

বালকটি তখন সব কথাই খুলিয়া বলিল। গুরুমহাশয় বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এ তুমি যা বলিতেছ—এ ত শ্রীকৃষ্ণের কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে দেখা দেন, হাসেন, কথা বলেন ? তুমি কি পাগল ?

বালকটি বলিল, তা ত আমি জানি না আমি জানি—রাখালদাদা।

কিন্তু এমন কে আছেন ভগবান ছাড়া ? তুমি তোমার রাখালদাদাকে দেখাইতে পার ?

এ আর এমন শক্ত কথা কি ? বালকটি উজ্জ্বল মুখে বলে, বনে চলুন, এখনই দেখাইয়া দিতেছি।

এখনই চলো। বলিয়া গুরুমহাশয় উঠিয়া পড়েন।

কিন্তু বনে গিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও সেদিন বালক তাহার রাখালদাদার দেখা পাইল না। তখন সে কাঁদো-কাঁদো গলায়

বলিল, রাখালদাদা, তুমি কোথায় আছ, তোমার পায়ে পড়ি তুমি দেখা দাও, নহিলে গুরুমহাশয় যে আমাকে মিথ্যাবাদী ভাবিবেন।

এইবার উত্তর আসিল বনের মধ্য হইতে, তেমনি মিষ্ট গলায় কে বলিল, তোমার গুরু-মহাশয়ের পক্ষে আমার দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বলো। শিশুর মত সরল মন যার নয়, সে আমার দেখা পায় না। আরও কিছুদিন তাঁহাকে চেষ্টা করিতে বলো মনকে সরল ও নিষ্পাপ করিতে।

বাস্তবিক শিশুর মত সরল বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভরে না ডাকিলে ভগবানের দেখা পাওয়া যায় না। যীশুও বলিয়া গিয়াছেন, 'শিশুদের আমার কাছে আসিতে দাও, উহাদেরই মত সরল যাহারা, কেবল তাহাদেরই স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার অধিকার আছে।'

# ভিখারী রাজা

অনেকদিন আগে দিল্লীতে খুব বড় এক ফকির বা মুসলমান সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার এমনি কিছুই ছিল না, ভিক্ষা করিয়া কালাতি-পাত করিতেন ও ভগবানের নাম করিতেন—এমন কি আহারের একটা থালাও ছিল না।

যাহা হউক—একবার খুব জলকষ্ট দেখিয়া ফকিরের ইচ্ছা হইল গরীব দুঃখীর জন্য কতক-গুলি জলাশয় করাইয়া দিবেন, কিন্তু তিনি ত নিঃস্ব ফকির, টাকাপয়সা কোথায় পাইবেন? অথচ টাকাপয়সা না হইলে ত আর জলাশয় খনন করা চলে না।

অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, বাদশার কাছে যাওয়া যাক্—তাঁহার ত আর কোন অভাব নাই—এ কটা টাকা আর তাঁহার কাছে কী!

যেমন ভাবা অমনি কাজ। তখনই তিনি বাদশার প্রাসাদে গেলেন। সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলেন বাদশা মসজিদে গিয়াছেন নামাজ করিতে। ফকিরও সেই মসজিদে গেলেন। বাদশা

তখন নামাজ করিতেছেন দেখিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নামাজ শেষ হইলে বাদশা আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাইতে

ও কি ফকির সাহেব, চলিয়া যান কেন?

শুরু করিলেন, হে ভগবান, তুমি আমাকে আরও ঐশ্বর্য্য দাও, আরও রাজ্য দাও,—ইত্যাদি।

ফকির সেই শুনিয়াই উঠিয়া পড়িয়াছেন। বাদশা চোখ খুলিয়া দেখেন যে ফকির চলিয়া যাইতেছেন।

ও কি ফকির সাহেব, চলিয়া যান কেন? কিছু দরকার ছিল নাকি আমার কাছে?

হ্যাঁ, তা ছিল একটু। ফকির শান্তকণ্ঠে বলিলেন।

কৈ বলিলেন না ত?

আর দরকার হইবে না।

সে কি কথা! কি দরকারে আসিয়াছিলেন যা এখনই শেষ হইয়া গেল?

সম্রাট আমি আপনাকে বাদশা জানিয়া কিছু ধন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম, তা দেখিলাম যে আপনিও ভিক্ষা চাহিতেছেন দুনিয়ার বাদশার কাছে। অর্থাৎ আপনিও আমার মত ভিখারী। ভিখারীর কাছে ভিক্ষা চাহিয়া লাভ কি? চাহিতেই যদি হয় ত আপনিও যাহার কাছে চাহিতেছেন সেই রাজরাজেশ্বরের কাছেই চাহিব।

মানুষের বাসনার শেষ নাই। ঈশ্বরকে ডাকে অধিকাংশ মানুষই সেই বাসনা মিটাইতে স্বার্থ লইয়া।

# শিব-রামের যুদ্ধ

পুরাকালে একবার শিব ও রামের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল।

শিব বলেন, আমি তোমার চেয়ে সব দিক দিয়াই বড় রাম, তুমি আমাকে গুরু বলিয়া মানিয়া লও, প্রণাম করো।

রাম বলেন, আমিই তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে গুরু বলিয়া মানো আগে!

এই লইয়া দুইজনে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। শেষে স্থির হইল দুইজনে যুদ্ধ করিবেন, যুদ্ধে যিনি জিতিবেন তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইবেন।

শুরু হইল লড়াই। সে কি যে-সে লড়াই? চারিদিক প্রলয়ের মেঘে ঢাকিয়া গেল, পৃথিবী ও স্বর্গ কাঁপিতে লাগিল থর থর করিয়া, দেবতারা পর্য্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন। সৃষ্টি বুঝি বা রসাতলে যায়। এ যুদ্ধ না থামিলে মহাপ্রলয় আসিল বলিয়া।

এধারে, মনিবরা যখন বিবাদ করে তখন ভৃত্যরা কি আর স্থির থাকিতে পারে? রামের বানররা শিবের সঙ্গী ভূতদের দেখিয়া দাঁত

খিঁচাইল, ভূতরাও নাকীসুরে বানরদের গালি দিতে লাগিল।

বানররা বলিল—'রও!' ভূতরাও বলিল—'রও!'

বিষম যুদ্ধ—বানরেরা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনে, ভূতরা আনে পাথর। গাছ আর পাহাড় বুঝি থাকে না কোথাও।

এধারে কিছুক্ষণ বাদে দেবতারা শিবকে বলিলেন, প্রভু, সৃষ্টি যে থাকে না! অসময়ে প্রলয় আনিবেন এই কি আপনার ইচ্ছা?

শিবের চমক ভাঙ্গিল। তাইত, এ কী করিতেছেন তিনি? একটু বিনয় স্বীকার করিলেই ত গোল চুকিয়া যায়।

শিব অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, রাম, তোমারই জিৎ, তুমি আমার গুরু, আমি মানিয়া লইতেছি।

রামও তীর তূণে পুরিয়া বলিলেন, তাই কি হয় প্রভু? আমি শুধু আপনার লীলা দেখিবার জন্যই রাগাইয়াছিলাম। আপনি সবদিক দিয়াই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনিই আমার গুরু।

শিব তখন রামকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন, রাম লইলেন শিবের পদধূলি।

শিব রামকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন

ব্যস্—সব মিটিয়া গেল।

কিন্তু মনিবদের ত মিটিল—চাকরদের মেটে কই? চেলা-চামুণ্ডারা যে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। কিচির-মিচিরের অন্ত নাই।

শিব বিরক্ত হইয়া বলেন, এই, থাম্ না।

রামও বলেন তাই।

তাহারা বলে, আমরা যে থামিতে পারি না কর্ত্তা। ঝগড়া যে শেষ হয় নাই।

আরও কিছুক্ষণ পরে শিব-রাম দুইজনেরই বিরক্তি বোধ হইল। তাঁহারা তখন ধমক দিয়া উঠিলেন, থাম্ এখনই বলিতেছি, নহিলে রক্ষা থাকিবে না।

বানর ও ভূতরা ভয় পাইয়া থামিল, কিন্তু বলিল, আমাদের বিবাদ যে মেটে নাই প্রভু—এখন আপনারাই বলিয়া দিন এ বিবাদ কোথায় রাখি ?

শিব অনেক ভাবিয়া বলিলেন, বিবাদটা দুইভাগ করো। একটা ভাগ দাও অহঙ্কারের ঘাড়ে চাপাইয়া, আর একটা দাও স্বার্থবুদ্ধিকে। যখনই কোন মানুষ বা জাতি এই স্বার্থবুদ্ধি বা অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিবে, তখনই তাহাদের মধ্যে এই বিবাদের আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে।

তাহাই হইল।

সেই বিবাদ আজও আছে সেইভাবে। যখনই কোন জাতি বা সম্প্রদায় ঐ দুটি দুর্গুণকে প্রশ্রয় দেয়, তখনই সেই পুরাতন বিবাদ নিজের রূপ ধারণ করে। যেখানে যত এই দুইটির সমাবেশ, যুদ্ধ ততই প্রলয়ের আকার ধারণ করে সেখানে—তাহা ত তোমরা চোখে দেখিতেছই।

# মন্ত্রীর বুদ্ধি

এক রাজা তাঁহার মন্ত্রীকে সন্দেহ করিয়া কারাগরে পাঠান। রাজা লোক ভাল ছিলেন না—তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল যে মন্ত্রী তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করিতেছেন।

মন্ত্রী ত কারাগারে পচিতেছেন, দিনের পর দিন। মুক্তির কোন আশা নাই, রাজার যে মতি কোনদিন বদলাইবে সে ভরসাও নাই। অথচ কিই বা উপায়? পাহাড়ের উপর কারাগার, কোনমতে যদি বা পাঁচিল টপকাইয়া বাহির হইতে পারেন ত লাফাইয়া নীচে পড়িলেই মৃত্যু। বহু নীচে, কয়েক হাজার হাত নীচে—তবে সমতল ভূমি।

এধারে মন্ত্রীর স্ত্রী—সে বেচারীও খুব ভাল-

মানুষ—রোজ রোজ পাহাড়ের নীচে আসিয়া বসিয়া থাকে আর ঊর্দ্ধমুখে কারাগারের জানলার দিকে চাহিয়া কাঁদে।

অত নীচে হইলেও মন্ত্রী তাহা লক্ষ্য করেন রোজই, বুঝিতেও পারেন যে, সে বসিয়া কাঁদিতেছে; কিন্তু কিই বা করিবেন, দুঃখ করা ছাড়া যে আর কিছুই করিবার নাই তাঁহার।

মন্ত্রী রোজই ভাবেন, ভাবিয়া ভাবিয়া একটা উপায়ও বাহির করেন। তখন শীতকাল, গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে চারিদিকে—তাহার দুই একটি উড়িয়া কারাগারের মধ্যে আসে। তাহারই একটাতে তিনি একদিন নখ দিয়া স্ত্রীকে এক চিঠি লিখিলেন। লিখিলেন, খানিকটা সরু দড়ি এবং খানিকটা সুতা ও একটু মধু লইয়া আসিও কাল।

মন্ত্রীর স্ত্রী বুঝিতে পারে না কি-জন্য প্রয়োজন, তবু সব গুছাইয়া লইয়া আসে। সেদিন সে নীচে আসিতেই আর একটা পত্র উড়িয়া আসিয়া পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল, মোটা দড়ির সহিত মাঝারি দড়ি বাঁধো, তাহার সহিত বাঁধো সরু

দড়ি, আবার সরু দড়ির সঙ্গে বাঁধো সুতা। তাহার পর সুতার গায়ে খানিকটা মধু মাখাইয়া ফেলিয়া রাখো।

তাহারই একটাতে তিনি একদিন নখ দিয়া স্ত্রীকে এক চিঠি লিখিলেন

স্ত্রী সেইমত কাজই করিল।

এধারে মধুর গন্ধে পিপীলিকার দল ছুটিয়া আসিল। পিপীলিকার স্বভাব হইতেছে খাদ্যদ্রব্য

পাইলেই উহারা নিজ গর্ত্তে টানিয়া লইয়া যায়। আগে সঞ্চয়, তাহার পর খাওয়া। তাহারা সুতাটিতে মধুর আস্বাদ পাইয়া সকলে মিলিয়া সুতাগাছি লইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। মসৃণ পাথরের গা বাহিয়া একেবারে গিয়া উঠিল কারা-গারের কোণে, সেইখানেই তাহাদের গর্ত্ত। এখানে-যে পিপীলিকার গর্ত্ত আছে এবং সে পিপীলিকারা-যে নীচে অবধি সারি দেয়, তাহাও মন্ত্রী লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

সুতরাং তিনি যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। পিপীলিকারা সুতাটিকে টানিতে টানিতে উপরে উঠাইল। তার পরের কাজটা মন্ত্রীর কাছে খুবই সোজা। সুতার টানে সরু দড়ি আসিল, সরু দড়ির টানে মাঝারি দড়ি, তারপর মোটা দড়ি আসিতে আর কতক্ষণ ?

তখন সেই মোটাদড়ি জানলায় বাঁধিয়া সেই দড়ি বাহিয়া তিনি অনায়াসে নীচে নামিয়া আসি-লেন এবং নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিলেন।

বুদ্ধি থাকিলে মানুষ কখনও হতাশ হয় না।—উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করে। আর বুদ্ধিমান লোক কখনও সামান্য বলিয়া কোন জিনিষকেই উপেক্ষা করে না। অতি সামান্য জিনিষ দিয়া শুরু করিলে ক্রমে ক্রমে খুব বড় জিনিষও করায়ত্ত হয়।